



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 962 - 970

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ : ভ্রমণ সাহিত্য অবলম্বনে একটি পাঠবিব্লেশন

রাফিকা খাতুন

Email ID: rafikakhatun859@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Abstract

Discussion

ভূমিকা - কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেমন কাব্য, নাটক, উপন্যাস এবং ছোটগল্পসহ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ করেছেন, তেমনি ‘ভ্রমণ-সাহিত্য’ ও তাঁর এক অনবদ্য সৃষ্টি। দেশ-বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে তিনি ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণ পিপাসু মন দেশ বিদেশ ভ্রমণের জন্য সদা উৎসুক। প্রথম তিনি পিতার সঙ্গে বাইরে অর্থাৎ হিমালয় যাত্রা করেন। ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে ‘হিমালয় যাত্রা’ অংশে তার উল্লেখ রয়েছে -

“এমন দুশ্চিন্তার সময় একদিন তেতলার ঘরে ডাক পড়িল। পিতা জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তাঁহার সঙ্গে হিমালয় যাইতে চাই কি না। ‘চাই’ এই কথাটা যদি চীৎকার করিয়া আকাশ ফাটাইয়া বলিতে পারিতাম, তবে মনের ভাবের উপযুক্ত উত্তর হইত। কোথায় বেঙ্গল একাডেমি আর কোথায় হিমালয়!”^১

কখনো কর্মের খাতিরে, কখনো শুধু ভ্রমণের জন্য কবিকে দেশ-বিদেশ যাত্রা করতে হয়েছে। যেমন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করেছেন ঠিক তেমনি বিলেতও বহুবার যাত্রা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এগারো বছর বয়সে পিতার সাথে হিমালয় এবং মাত্র সতেরো বছর বয়সে বিলেত যাত্রা করেন। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরবেন বলে, বিলেত যাত্রা করেন। ব্যারিস্টার হওয়ার স্বপ্ন অসম্পূর্ণ থাকলেও প্রকৃত ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে দেশে ফেরেন। এই সময়ের রচনা ‘ইউরোপ প্রবাসীর পত্র’। বিদেশে গিয়ে দেশি বাঙালিদের আচরণ দেখে রবীন্দ্রনাথ অবাক হন -

“দেখি যে আমাদের গৃহিনী তাঁর দিশি বস্ত্র পরে ছেলেপিলে নিয়ে ঘরে অল্পপূর্ণার মতো বিরাজ করছেন। তাঁর দিশি কাপড় দেখে তার বিলিতি বন্ধুরা অত্যন্ত প্রশংসা করেন ও তার দিশি বন্ধুরা সেই পরিমাণে খুঁতখুঁত করে।”^২

আমরা ভারতবাসী ইংরেজকে নকল করতে গিয়ে সাহেবদের ঠাকুরদা সেজে বসে আছি। নিজের অস্তিত্ব ভুলে অন্য দেশের সংস্কৃতি গ্রহণ করাতে সমস্যা আছে। তবে বিলিতিদের কাছ থেকে অনেক শেখার আছে। তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাধীন মত প্রকাশের ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হন কবি। তাদের শিক্ষাব্যবস্থা খুব উন্নত তা আমাদের স্বীকার করতেই হবে। পরাধীন ভারতবর্ষে কবির জন্ম ও বড় হয়ে ওঠা। যতটুকু তাদের কাছ থেকে শেখা যায়, তা আমাদের শিখতে হবে। তাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে নুতনত্ব রয়েছে সন্দেহ নেই। ভিন্ন সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব প্রত্যক্ষ দেখেছেন স্কুল জীবনে। তাই স্কুল জীবনে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে -

“পইতা উপলক্ষে মাথা মুড়াইয়া ভয়ানক ভাবনা হইল, ইস্কুল যাইব কি করিয়া। গোজাতির প্রতি ফিরিঙ্গির ছেলের আন্তরিক আকর্ষণ যেমনই থাক ব্রাহ্মণের প্রতি তাদের ভক্তি নাই! অতএব, নেড়া মাথার উপরে তাহারা আর-কোনা জিনিস বর্ষণ যদি নাও করে তবে হাস্যবর্ষণ তো করিবেই।”^৩

যাই হোক, যেমন যেমন কবির বয়স বেড়েছে, বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন, তেমনি বিশ্বকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। নিজের দেশে ইংরেজের শাসন দেখেছেন, আবার বিলেতে গিয়ে তাদের স্বাধীনতার সুখ দেখেছেন। যা পরবর্তী ভ্রমণ সাহিত্যে ব্যাখ্যা করেছেন। ‘রাশিয়ার চিঠি’ তাঁর সন্তর বছর বয়সে গিয়ে লেখা গ্রন্থ। সেখানে রাশিয়ার উন্নতি, তাদের শিক্ষাব্যবস্থা, চাষীদের কর্মদক্ষতা কবিকে ভাবিয়ে তুলেছে -

“মস্কোতে একটি কৃষিভবন দেখতে গিয়েছিলুম। এটা ওদের ক্লাবের মতো। রাশিয়ার সমস্ত ছোট বড় শহরে এবং গ্রামে এরকম আবাস ছড়ানো আছে। এসব জায়গায় কৃষিবিদ্যা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় করেছে, এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করবার ব্যবস্থা কৃষকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।”^৪

আমরা পাঠক এই ভ্রমণ সাহিত্য গুলো পাঠ করে দেশ তথা বিদেশ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারি। এককথায় ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে জানতে এই ভ্রমণ সাহিত্য আমাদের সাহায্য করে। কবির বিশ্বভাবনা আমাদের বর্তমান সমাজকে প্রভাবিত করছে। ‘জাপানযাত্রী’ গ্রন্থে জাপানিদের কম সময়ের মধ্যে এত উন্নতির কারণ ব্যাখ্যা করেন -

“যেখানে একটা দেশের সমস্ত লোকই কম চেষ্টায়, কম জিনিস ব্যবহার করে, ব্যবস্থাপূর্বক কাজ করতে যাদের আশ্চর্য দক্ষতা, সমস্ত দেশ জুড়ে তাদের যে কতখানি শক্তি জমে উঠছে তার কি হিসেব আছে।”^৫

জাপানিদের সঙ্গে বাঙালির একটা যোগ আছে। তারাও মিশ্র জাতি বাঙালিও মিশ্র জাতি। এই জাপানিরাই এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রথম নতুনকে গ্রহণ করে। আর ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বপ্রথম বাঙালি জাতি নতুনকে গ্রহণ করেছে। তবে বাঙালির উন্নতি জাপানিদের মতো নয় কেনো, কবির মনে প্রশ্ন জেগেছে। যেমন জাপানিদের প্রশংসা করেছেন তেমনি সমালোচনা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেননি। এভাবে তিনি বিশ্বভ্রমণ করেছেন এবং নিজের দেশের উন্নতির কথা কল্পনা করেছেন। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সমস্ত দিকেই মনোনিবেশ করেন। তিনি তিনবার জাপান-যাত্রা করেন, প্রত্যেকবার ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। একাধিকবার ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে অনেক অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের দ্বার উদঘাটনের জন্য বিশ্বের ভারতী বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি উগ্রজাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করেন। অসহযোগ আন্দোলনকে মেনে নিতে পারেন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ যখন চলছে, তখন তিনি জাপানে ভ্রমণ করছেন। এর পর যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটবে, ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা কবি কল্পনা করেছিলেন। তাই বার বার লেখনীর মধ্যে মানুষের ধর্মকে বড় করে দেখিয়েছেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনই সত্যকার মিলন। বলা যেতেই পারে, কবির এই উদারতা বিশ্বভ্রমণের ফল। রবীন্দ্রনাথের শান্তির বাণী সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। কবির বিশ্বভ্রমণ, জগতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি ও তার রূপান্তর আমার গবেষণার বিষয়।

ভ্রমণ সাহিত্যের সাধারণ আলোচনা : উন্মেষ থেকে ঐশ্বর্য পর্ব—

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘ভ্রমণ সাহিত্য’ আসলে তাঁর ডায়েরী ও চিঠিপত্র। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদারি দেখাশোনার জন্য সাহজাদপুর, শিলাইদহ ও পতিসর সহ বিভিন্ন জায়গায় বাস করেছেন যার ফলে ভাতুস্পত্রী ইন্দিরা দেবীকে লেখা চিঠি গুলির সংকলন হিসেবে ‘ছিন্নপ্রত্নাবলী’ গ্রন্থটি পাই। ‘পথে ও পথের প্রান্তে’ গ্রন্থটিও ১৯২৬ সালে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় লিখিত ৬০ টি চিঠির সংকলন, যেটি লিখেছিলেন নির্মলকুমারী মহলানবীশকে। প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। এছাড়া ‘জীবনস্মৃতি’ গ্রন্থে আমেদাবাদ, বোম্বে, কারোয়ার ভ্রমণের উল্লেখ পাই। ‘পত্রধারা’ গ্রন্থমালার তিনটি সংকলন গ্রন্থই দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতার ফল। ‘পথে ও পথের’ গ্রন্থটিতে কিঞ্চিৎ বিদেশের উল্লেখ রয়েছে। তবে এগুলি দেশভ্রমণ, জমিদারি

দেখাশোনা দেশ সমন্ধে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখিত রয়েছে। প্রায় মূল সাতটি গ্রন্থকেই বিদেশ ভ্রমণের ফল বলা যায়, যা নিম্নে আলোচনা করা হল - 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' (১৮৮৮), 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরি' (১২৯৮) 'পথের সঞ্চয়' (লিখিত ১৯১২, প্রকাশিত ১৯৩৮), 'জাপান-যাত্রী' (১৯১৯), 'পশ্চিম যাত্রীর ডায়েরি' (১৯২৬), 'জাভা যাত্রীর পত্র' (১৯২৯), 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩০)।

'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' (১২৮৮) মাত্র সতেরো বছর বয়সে দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথে বিলেত যাত্রা করেন, এটি সেই সময়ে লিখিত গ্রন্থ। এই বিদেশ ভ্রমণকে আমরা উন্মেষ পর্ব বলতে পারি। সেই সময়ে ইউরোপের বাহ্যিক রূপ প্রত্যক্ষ করলেও ১৯১২ সালে তৃতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ করেন তখন ইউরোপের আধ্যাত্মিক শক্তিকে উপলব্ধি করেছিলেন। ইউরোপ নিজেকে অনেকটা ছাচে ঢেলে তৈরী করেছে। আমাদের এটাও মানতে হবে তার শিল্প, সাহিত্য, কলা কিন্তু লোহার দোকানে হাতুড়ি পিটিয়ে সৃষ্টি নয়। তার মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আছে বলেই তা সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরি' (১২৯৮)। দ্বিতীয় বার ইউরোপ যাত্রার ফলে লিখিত ডায়েরি। যেটি উৎসর্গ করছেন লোকন পালিতকে। আসলে তিনি কখনো একা বিদেশ যাত্রা করেননি। ১২৯৮ সালে দ্বিতীয়বার দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বন্ধু লোকন পালিতকে সঙ্গীরূপে পেয়েছিলেন। তবে তিনমাস ইউরোপ ভ্রমণের পর একাই ফিরে এলেন ভারতবর্ষে। তেমন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেননি, যেমনটি তৃতীয় বারে করেছিলেন। বয়সে বৈশিষ্ট্য ও মৃত্যুর আঘাত অনেকটা ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের উপর প্রভাব ফেলেছিলো। যার ফলে তৃতীয়বার বিলেত ভ্রমণের এক ভিন্ন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, যার প্রতিফলন পরবর্তী সাহিত্যগুলিতে পাওয়া যায়।



যাইহোক 'ইউরোপ প্রবাসীর পত্র' ও 'ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরি' দুটি গ্রন্থের একত্রিত সংকলন হলো 'পাশ্চাত্য ভ্রমণ' (১৩৪৩) যেটিকে বিদেশ ভ্রমণের উল্লেখ্য পর্ব রূপে চিহ্নিত করা হয়।

'পথের সঞ্চয়' ১৯১২ সালে তৃতীয় বার বিদেশ ভ্রমণের ফল। তবে গ্রন্থটি বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ সালে। এই সময় তিনি নিজের পরিবার তথা পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীর সঙ্গে বিলেত যান। এই সময়ে ১৩ নভেম্বর, ১৯১৩ সালে নোবেল প্রাইজ লাভ করেন। বিশ্বকবি রূপে রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পরে। এই সময় বিলিতি বন্ধু রূপে পেয়েছিলেন আয়ারল্যান্ডের কবি যেটসকে ও ইউরোপের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী রোসেনস্টাইনকে। দুই বন্ধুর মাধ্যমেই ইউরোপের আত্মাকে চিনেছিলেন। এরপর অবশ্য দুইবার আরো ইউরোপ যান তবে খুব বেশী দিন বাস করেননি। সেখান থেকে রাশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেছিলেন। কবি যেমন পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেছেন তেমনি এশিয়া মহাদেশের বিভিন্ন দ্বীপ ও দেশ ভ্রমণ করেন।

'জাপান যাত্রী' (১৯১৯) পত্রিকায় তিনটি নামে প্রকাশিত হয়— 'জাপান-যাত্রীর পত্র' (বৈশাখ -ভদ্র ১৩২৩), 'জাপানের পত্র (আশ্বিন কার্তিক এবং অগ্রহায়ণ ১৩২৩)', 'জাপানের কথা' (বৈশাখ ১৩২৪) এছাড়া 'ধ্যানী জাপান' (১৩৩৬)।

ইউরোপ তো রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়স থেকেই যাত্রা শুরু করেছিলেন। তবে এশিয়া মহাদেশে জন্মগ্রহণ করেও ৫৫ বছর বয়সে এশিয়ার জাপান দেশ যাত্রা করেন। তিনি ঘরে বসে জাপানকে যে অর্থে গ্রহণ করেছিলেন জাপান তা নয় আসলে। জাপানের ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিককেই তুলে ধরেছেন। এশিয়ার মধ্যে জাপানিরা যেমন নতুনকে গ্রহণ করেছেন তেমনি জাপান সবুজ পৃথিবীটাকে খেয়ে ফেলেছে বলে কবির মনে হয়। প্রথম দর্শনে জাপানকে লোহার জাপান বলে মনে হয়েছিল কবির। শীতপ্রধান দেশ জাপানের মানুষ কাজে ক্লান্ত হয়ে পরে না। তাদের জলবায়ু তাঁদের উন্নতির মূল সোপান। জলবায়ুর সাথে জাপানের শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য, টেকনোলজি সব একসাথে এগিয়ে যাওয়াতে সাহায্য করেছে। জাপান ভ্রমণকে আমরা বিকাশ পর্বে রাখতে পারি। জাপান ভ্রমণের ফলে তিনি জাপানকে ভারত তথা বিশ্বের সঙ্গে তুলনা করতে শুরু করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান যে অর্থে অংশগ্রহণ করেছিল, তার উগ্রতাকে সমালোচনা করেছেন। যা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনার বিষয়।

'পশ্চিম যাত্রী ডায়েরী' (১৯২৪) এই গ্রন্থটি দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ভ্রমণের ফল। তবে সোজা পেরু গিয়ে পৌঁছাননি। প্রথমে ইউরোপ ও পরে দক্ষিণ আমেরিকার কলম্বীয়া দেশের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে পরে পেরু পৌঁছান। সঙ্গে আছেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী ও তাদের পালিত কন্যা নন্দিনী।

'জাভা যাত্রীর পত্র' (১৯২৯) এই গ্রন্থটি একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বলা যেতে পারে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের বালি ও জাভা দ্বীপের প্রাণকে তুলে ধরেছেন। তাদের সংস্কৃতিকে ভারতীয় সংস্কৃতি ঠিক কতটা প্রভাব করেছে তা দেখে কবি অবাক হন। আসলে 'জাভাযাত্রীর পত্র' ও 'রাশির চিঠি' গ্রন্থ দুটি তাঁর ভ্রমণ সাহিত্যের ঐশ্বর্য পর্বের রচনা। জাভাযাত্রী রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীরূপে পেয়েছিলেন ভাষাবিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কে, সুরেন্দ্রনাথ কর ও আরো বেশ কয়েকজন আধ্যাপককে। প্রাচীন ভারতবর্ষের একটা নিজস্ব রূপ ছিল। শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল ভারত। তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়, বিক্রমশিলা, নালন্দা, ভালবি প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোক আসতো একটা সময়। এছাড়া পুরান কথার দিক থেকে দেখলে বিশ্বের চারটি মহাকাব্যের মধ্যে ভারতবর্ষের দুটি বাল্মীকি রচিত 'রামায়ণ' ও ব্যাসদেব রচিত 'মহাভারত'। এই দুটি মহাকাব্যের কাহিনীকে সাদরের সাথে গ্রহণ করেছেন জাভা বাসীরা। তারা নিজেদের মতো কাহিনীকে গড়ে নিয়েছেন ঠিক তবে অর্জুন তাঁদের কাছে আদর্শ পুরুষ। আমাদের দেশে যাত্রাপালা তাঁদের দেশে প্রকট রূপ ধারণ করেছে। যতদিন জাভায় ছিলেন প্রায় প্রত্যেকদিন নৃত্য, গীত, অভিনয় উপভোগ করেছেন। আর সব কাহিনীই কোনো না কোন ভারতবর্ষের পুরানকথাকে নিয়ে রচিত। আসলে জাভা যাত্রা করেছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের সংস্কৃতি বিশ্বের ঠিক কতটা প্রভাব করেছে সেই অনুসন্ধানী মন নিয়ে। তিনি সফলও হয়েছেন। জাভায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে দেখে মুগ্ধ হন। এমনকি সংস্কৃত ভাষার চলও সেখানে রয়েছে। বিশ্বভ্রমণ করেন আর উপলব্ধি করেন যে ভিন্ন সংস্কৃতি, ভিন্ন জলবায়ু থাকা সত্ত্বেও মানুষের মনের সঙ্গে মনের আশ্চর্য মিল রয়েছে। এই মিলনই সত্যিকারের মিলন।

‘রাশিয়া চিঠি’ (১৯৩০) গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্যের মধ্যে শেষ গ্রন্থ। তবে এর সাহিত্যমূল্য অপরিমিত। যা তিনি সারাবিশ্ব ভ্রমণ করে পাননি, তা পেলেন রাশিয়ায় গিয়ে। তিনি যে সময় দাঁড়িয়ে লিখছেন চিঠিখানি সে সময়ে রাশিয়ার অবস্থা ভারতবর্ষের থেকে খুব একটা ভালো ছিল না। বলসেভিক বিপ্লবের পর রাশিয়া নিজেকে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলে। সেই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া সর্বস্তরের মানুষের কল্যাণে লেগে পড়েছে। তাঁদের যেখানে কৃষিভবন তার পাশেই গড়ে তুলেছে বিদ্যালয়। তাঁদের শিক্ষাব্যবস্থাও প্রকৃত মানুষ করবার জন্য। যা বিশ্ব পরিব্রাজক কবিকে মুগ্ধ করে। তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনে সেই কাজ অনেকদিন আগেই শুরু করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আর্থিক সমস্যা বশত যতটা সফল হওয়া উচিত ততটা হতে পারেননি। যাইহোক কবির বিশ্বভ্রমণই কবির জগতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছিল।

‘পথের সঞ্চয়’ গ্রন্থে বোম্বাই শহরের ব্যাখ্যা দিয়েছেন -

“বোম্বাই শহরের একটা বিশেষ চেহারা আছে, কলিকাতার যেন কোন চেহারা নাই, সে যেন যেমন-
তেমন, জোড়া-তোড়া দিয়া তৈরি হয়েছে।”^৬

যখন রাজ্যের বাইরে গেছেন তখন রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যের তুলনা করেছেন। দেশের বাইরে গিয়ে দেশকে দেশের সাথে তুলনা করেছেন। আর সর্বমোট সাতটি গ্রন্থ বিদেশ ভ্রমণের ফলে লিখে আমাদের উপহার দিয়েছেন। এই গ্রন্থগুলি ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে জানতে অনেকটা সাহায্য করে। এই যে বিশ্ব পরিভ্রমণ ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের উপর ঠিক কী রূপ প্রভাব ফেলেছিল, সেই সঙ্গে সাহিত্যের উপর কি প্রভাব ফেলেছে তা আলোচনা করা আমার গবেষণার বিষয়। আর সেটাকে অভিসন্দর্ভের মাধ্যমে একত্রে সমগ্ররূপে ভ্রমণ সাহিত্য গুলিকে তুলে ধরাই লক্ষ্য।

পাশ্চাত্য ভ্রমণ— বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে বিশ্বভ্রমণ করেছেন, তাঁর এই বিশ্ব ভ্রমণকে স্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ভাগ করলে এক পাশ্চাত্য ভ্রমণ ও অন্যদিকে প্রাচ্য ভ্রমণ দুটি মূল ভুখণ্ডে বিভক্ত করা হয়। এই দুটি ভাগ শুধুমাত্র স্থানকে চিহ্নিত করে না। দুই বিশ্বের দেশের মধ্যে আকাশ-পাতাল পার্থক্য। ইউরোপ বাসীরা যেভাবে জীবনটাকে দেখে ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের জাভা, বালি দ্বীপের মানুষেরা তেমন করে জীবন তথা সমাজ ব্যবস্থাকে তাদের মতো করে গড়ে তুলেনি। তবে কবিগুরু বিশ্বযাত্রা শুরু করেছিল পশ্চিমের বিভিন্ন দেশ থেকে। মাত্র সতেরো বছর বয়সে ইউরোপ যাত্রা করেন এবং প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে দ্বিতীয় বার ইউরোপ যান। তবে কম বয়সে ইউরোপের বাহ্যিক রূপকে প্রত্যক্ষ করলেও উর্ধ্ব পঞ্চাশ বয়সে ইউরোপ গিয়ে ইউরোপের আত্মাকে দেখলেন। একটা জাতি চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছে শুধু মাত্র একটা কারণের জন্য নয়। তাঁদের যেমন লক্ষী রয়েছে তেমনি সরস্বতী। তবে বলা যায় সরস্বতী ছিল বলেই লক্ষী ধরা দিয়েছে। তাঁদের শিক্ষা ব্যবস্থা, সাহিত্য, শিল্পকলার সবই উন্নত। শিল্প থেকে শুরু করে সাহিত্য প্রত্যেক জিনিসের এরা কদর করে যা বন্ধু ইয়েটস ও রসেনটাইনকে দেখে বুঝতে পারেন। বিশ্বভ্রমণ ও পারিবারিক পরিবেশ তাঁর চিন্তাভাবনার উপর প্রভাব ফেলে যার প্রতিফলন আমরা সাহিত্যে দেখতে পাই। বিশ্বকবি এতো বৃহৎভাবে জগতকে দেখতে পেরেছিলেন, সমগ্ররূপে বিশ্বকে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন তার কারণ বিশ্বভ্রমণ। নিজে এশিয়া মহাদেশে জন্মগ্রহণ করলেও নিজেকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরেছেন। একাধিকবার ইউরোপ যাত্রা করেন, প্রত্যেকবারে ইউরোপের বিভিন্নরূপ অনুভব করেছিলেন। আর নিজেকে বৃহৎরূপে পেয়েছিলেন। এছাড়া কুবেরের প্রধান আড্ডা আমেরিকায় বিভিন্ন বক্তৃতা দিয়ে আর্থিক দিক থেকে স্বচ্ছল হয়ে সেই টাকায় তাঁর স্বপ্নের বিশ্বের ভারতী বিশ্বভারতীর আর্থিক সমস্যার সমাধান করেছিলেন। বলা যেতেই পারে তিনি পাশ্চাত্য থেকে অনেক সুযোগ সুবিধা পেয়েছিলেন। বিশ্বকে ভালোবেসেছিলেন এবং বিশ্বকে পেয়েছিলেনও সত্যরূপে।



প্রাচ্য তথা এশিয়া ভ্রমণ— বিশ্বপরিব্রাজক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এশিয়ার বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। ভারতবর্ষ জন্মভূমি ও তৎকালীন অবিভক্ত বাংলাদেশে জমিদারি করা ছাড়াও জাপান, চীন, রাশিয়া, ইন্দোনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জের জাভা ও বালি দ্বীপ ১৯৩২ সালে ইরান ও ১৯৩৪ সালে শেষবারের মতো এশিয়া তথা শ্রীলংকা যাত্রা করেন। এছাড়াও যখন তিনি প্রথমবার জাপান যাত্রা করেন সেই সময় কলকাতার খিদিরপুরে তোষামারু নামক জাপানি জাহাজে যাত্রা করলেও মায়ানমারের (তৎকালীন বর্মায়) প্রায় সারাদিন সেখানকার বৌদ্ধ মন্দিরের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেন। সেখানে মেয়েদের অবাধে কাজ করার ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হন আবার চীন সাগরের উপর দিয়ে বয়ে যেতে যেতে সেখানকার শ্রমিকদের কাজ করার উদ্যম দেখে বলেন -

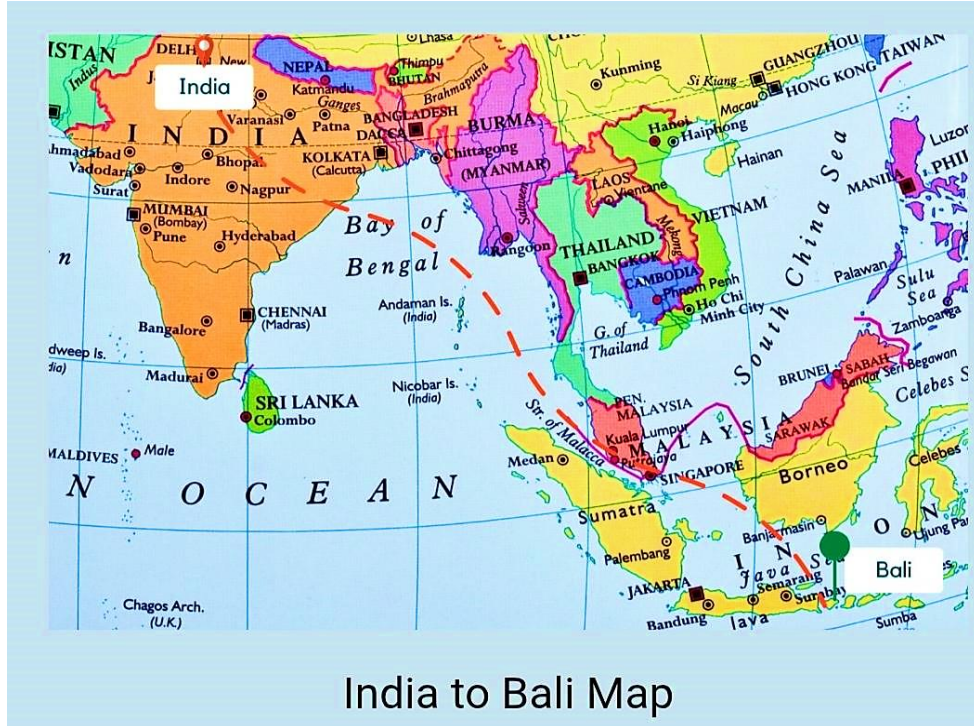
“ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাবো? সেখানে মানুষ আপনার বারো আনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্ছে।”^৭

আর এক রকম দৃশ্য দেখেন সিঙ্গাপুরে। অর্থাৎ এই জাপান যাত্রায় তিনি খুব কম সময়ে হলেও সিঙ্গাপুরের সৌন্দর্য উপলব্ধি করেছিলেন। তারপর চীনের হংকং বন্দরে দুই দিন কাটিয়ে জাপান পৌঁছান। যদি সমগ্র অর্থে ধরা যায় এশিয়ার অনেকগুলি দেশই ভ্রমণ করেছেন। তবে ডায়েরি ও চিঠিপত্র লেখেন মাত্র কয়েকটি দেশের নাম নিয়ে। যেমন জাপান যাত্রী, জাভা যাত্রীর পত্র, রাশিয়ার চিঠি ইত্যাদি। গ্রন্থগুলিতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনার পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন দেশে শিক্ষা প্রণালী, সংস্কৃতির বর্ণনা। রাশিয়ার অবস্থা ঠিক আমাদের ভারতবর্ষের মতোই ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের অল্প সময়ের মধ্যে উন্নতি দেখে অবাকই হয়েছিলেন। যেটা তিনি শ্রীনিকেতনে করতে চেয়েছিলেন তা বিশ্বের বৃহত্তম দেশ রাশিয়া সারা দেশ জুড়ে করে বসে আছে। তাই কবি পুত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বলছেন, রাশিয়ার চিঠির প্রথম পত্রে -

“আমরা শ্রীনিকেতনে যা করতে চেয়েছি এরা সমস্ত দেশ জুড়ে প্রকৃষ্টভাবে তাই করছে। আমাদের কর্মীরা যদি কিছুদিন এখানে এসে শিক্ষা করে যেতে পারত তা হলে ভারী উপকার হত। প্রতিদিনই আমি ভারতবর্ষের সঙ্গে এখানকার তুলনা করে দেখি আর ভাবি কি হয়েছে আর কি হতে পারত। ...

কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষের অবস্থার সঙ্গে এদের জনসাধারণের অবস্থার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল - এই অল্পকালের মধ্যে দ্রুতবেগে বদলে গেছে- আমরা পড়ে আছি জড়তার পাকের মধ্যে আকর্ষণ নিমগ্ন।”^৮

তার বেশ কিছুদিন আগে জাভা ও বালি দ্বীপ ভ্রমণ করে এসেছিলেন। এই বিদেশ ভ্রমণাত্মক সাহিত্যগুলির মধ্যে জাভা যাত্রীর পত্র উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটিতে প্রাচীন ভারতবর্ষে মহিমা বর্ণনা করেছেন। জাভা গিয়ে প্রাচীন ভারতকে আরো বড়ো করে পেলেন। যে পুরান কথার চর্চা ভারত থেকেই ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করেছে। সেই সংস্কৃতি পুরান কথাকে নৃত্য গীতের মাধ্যমে তারা আজও ধরে রেখেছে। অবশ্য পোশাক, খাবার উপকরণ, রীতিনীতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবু যেন জাভা দ্বীপের সাথে ভারত উপদ্বীপের আশ্চর্য মিল রয়েছে। যা বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপলব্ধি করেছিলেন।



দেশীয় সমাজ ও বিলিতি সমাজের তুলনামূলক উপলব্ধি— কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছিলেন। ভ্রমণের মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, তার প্রতিফলন সাহিত্য জগতেও লক্ষ্য করা যায়। জগতকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়ে যায় ভ্রমণের ফলে। বিদেশের মানুষের কাজ তাদের শিক্ষা-স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি দেখে, কবি নিজের দেশের সাথে তুলনা করে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন। “জাপান-যাত্রী” গ্রন্থে বলেন -

“এদের মেয়ে পুরুষ ছেলে সকলে মিলে কাজ করবার এই ছবি দেখে আমার দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল। ভারতবর্ষে এই ছবি কবে দেখতে পাব? সেখানে মানুষ আপনার বারো-আনাকে ফাঁকি দিয়ে কাটাচ্ছে।”^৯

রাশিয়া ভ্রমণ করে কবির একই উপলব্ধি হয়েছে। একসময় রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা ভারতবর্ষের চাইতে মন্দ ছিল। ১৯১৭ বলশেভিক বিপ্লবের পর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে রাশিয়া আত্মপ্রকাশ করে। সেখানে নিম্নশ্রেণীর মানুষ থেকে সরকারি আমলা, বিজ্ঞানিক সকলে এক কাজে জড়িয়ে পড়েছে। তারা চায় দেশের উন্নতি -

“সিভিল সার্ভিসের আমলাদের দিয়ে এরা মোটা মাইনের আপিস চালাবার কাজ করছে না; যার যোগ্য লোক, যারা বৈজ্ঞানিক, তারা সবাই লেগে গেছে। এই দশ বছরের মধ্যে এদের কৃষিচর্চা বিভাগের যে উন্নতি ঘটেছে তার খ্যাতি ছড়িয়ে গেছে জগতের বৈজ্ঞানিক-মহলে।”^{১০}

বিলেতের কাছ থেকে আমাদের অনেক শেখার আছে। বিশ্বের সাথে সম্পর্ক রাখবো না, তাতে নিজেদেরই ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা। তাই গান্ধীজিকে সম্মান করলেও অসহযোগ আন্দোলনকে তিনি মেনে নিতে পারেনি। রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা সমস্ত দিকটাই কবি ভেবেছিলেন। বিশ্বের সাথে সম্পর্ক রেখে সকলে সমান গতিতে এগিয়ে গেলে অবশ্যই পৃথিবীর উন্নতি সম্ভব। হিংসা লোভ এগুলো অশান্তি ডেকে আনে। পৃথিবীর মঙ্গল একসাথে এগিয়ে যাওয়াতে। মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ককে বড় করে দেখেছেন। মিলনের ভাবনা থেকেই বিশ্বের ভারতী বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছেন। ‘গীতাঞ্জলি’ কাব্যগ্রন্থের কবিতায় বলছেন -

“যুক্ত করো হে সবার সাথে
যুক্ত করো হে বন্ধন।”

বিশ্ববোধ— পরপর দুইবার ইউরোপ যাত্রা করেন। যার ফলে ‘ইউরোপ প্রবাসীর পত্র’ ও অপরটি হচ্ছে ‘ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরী’ লেখেন। সতেরো বছরের কবি ইউরোপের মেয়েদের স্বাধীনতা দেখে মুগ্ধ হন। দ্বিতীয়বার ইউরোপ ভ্রমণ করার পর ভাবের পরিবর্তন দেখি। বয়সের বৈশিষ্ট্য, যে নারীকে প্রথমবারে স্বাধীনচেতা সুখী দেখেছিলেন। সেই নারীকে ত্রিশ বছর বয়সে দুঃখী দেখেছেন -

“ভালবাসাহীন বন্ধনহীন শূন্য স্বাধীনতা নারীর পক্ষে অতি ভয়ানক- মরুভূমির মধ্যে অপরিণীত স্বাধীনতা
গৃহীলোকের পক্ষে যেমন ভীষণ শূন্য।”^{১১}

আমাদের দেশে নারীরা তাদের গৃহ স্বামী-পুত্র নিয়েই সুখী। কিন্তু বিদেশে নারীদের সুখী হতে অনেক কিছু প্রয়োজন হয়। তবু নারী সেখানে সুখী কিনা কবির মনে সংশয়। কিন্তু জাপান যাত্রার সময় রেঙ্গুনে অবাধে নারীদের কাজ করার স্বাধীনতাকে প্রশংসা না করে থাকতে পারেননি, বলছেন -

“কেবল বাইরে বেরতে পারাই যে মুক্তি তা নয়, অবাধে কাজ করতে পাওয়া মানুষের পক্ষে তার চেয়ে
বড় মুক্তি। পরাধীনতাই সব-চেয়ে বড় বন্ধন নয়, কাজের সংকীর্ণতাই হচ্ছে সব-চেয়ে কঠোর খাঁচা।”^{১২}

বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন। ভ্রমণের অভিজ্ঞতাকে সঞ্চয় করে দেশের কল্যাণে অভিজ্ঞতার প্রয়োগ করেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, রাজনীতি সমাজ এমনকি দেশের সর্বনিম্ন স্তরের যে শ্রমিক চাষী তাদের কথাও তিনি চিন্তা করেছেন। একটা দেশের কল্যাণ ঘটাতে হলে অবশ্যই নিম্নস্তরের মানুষকে আগে সামনের দিকে টেনে নিয়ে আসতে হবে। যেটা রাশিয়ায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া জালিয়ায়ানাবাগ হত্যাকাণ্ড ও স্বদেশী আন্দোলনের উগ্র রূপ লক্ষ্য করেন। ধর্মের নামে হানাহানি কাটাকাটি মেনে নিতে পারেননি। তাছাড়া বিদেশি দ্রব্য বর্জন করো এবং স্বদেশী দ্রব্য গ্রহণ করো এ বিষয়টার তীব্র প্রতিবাদ করেন। দাদা জ্যোতিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে দেখেছিলেন দেশের জন্য নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিতে। তাতে দেশের খুব কল্যাণ দেখেন নি। ভিক্ষা দিয়ে মঙ্গল কামনা বৃথা। প্যারিসে গিয়ে মনে হয়েছিল এদেশে গরীব লোক নেই। একটা দেশ সর্বস্বভাবে এগিয়ে যাচ্ছে কিভাবে সেটা আমাদের গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ বিশ্বযাত্রী রবীন্দ্রনাথ দেখেন পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি রয়েছে। বৈচিত্র্যতা সংসারের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। তবে বিদেশের সমাজব্যবস্থা, শিক্ষা পদ্ধতি নিজের দেশে প্রয়োগ করা যায় তা হলে লাভ বৈ লোকসান নয়। স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে বলছেন-

“বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্যই যুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। ... আমাদের দেশে সরকার বাহাদুর সমাজের কেহই সরকার সমাজের বাহিরে। অতএব যে-কোনো বিষয় তাহার কাছ থেকে হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে।”^{১৩}

উপসংহার— পরিশেষের সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণ সাহিত্যে শুধুমাত্র যাত্রাপথের বর্ণনা বা বিদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা নেই। বরঞ্চ বিদেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য তাদের অগ্রগতির মূল সোপান, তাঁর সাহিত্যে তুলে ধরেছেন রাশিয়ার চিঠিতে বলছেন -

“রাশিয়ায় গিয়েছিলুম ওদের শিক্ষাবিধি দেখবার জন্যে। দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছি। আট বছরের মধ্যে শিক্ষার জোরে সমস্ত দেশের লোকের মনের চেহারা বদলে দিয়েছে।”^{১৪}

আমার দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ভাষা সমস্যা খুব একটা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই সমস্যা নিয়ে জাপানে। জাপানিরা যা করেছে -

“আধুনিক সমস্ত বিদ্যাকে জাপানি ভাষায় সম্পূর্ণ আয়ত্তগম্য করে তবে জাপানি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে সত্য ও সম্পর্ক করে তুলেছে। তার কারণ, শিক্ষা বলতে সমস্ত দেশের শিক্ষা বুঝে - ভদ্রলোক বলে এক সংকীর্ণ শ্রেণীর শিক্ষা বোঝে নি।”^{১৫}

রাশিয়া সহ ইউরোপের নানান দেশে দেখেছিলেন উন্নতির মূল শিক্ষা। এমনকি জাপানে গিয়ে জাপানিদের উন্নতি কবিকে ভাবিয়ে তুলেছে। এত কম সময়ের মধ্যে একটা জাতির উন্নতির পেছনে রয়েছে সিস্টেমটিক শিক্ষাব্যবস্থা। যা আজকে একবিংশ শতাব্দীতে এসে আরো সত্য হয়ে উঠেছে। বই মুখস্থ বিদ্যাকে তিনি কোনো দিনই মেনে নেননি। রাশিয়ায় চাষীদের কৃষি ভবনের পাশেই স্কুল রয়েছে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করা একান্ত প্রয়োজন যেটা রাশিয়ানরা করেছে। তা ছাড়া চাষীরও উন্নতি হচ্ছে না। অথচ দেশের উন্নতি চাইলে তাদেরকেই আগে শিক্ষা দিতে হবে। বিশ্ব ভ্রমণের ফলে কবির চিন্তাভাবনার বিরাট পরিবর্তন ঘটেছে। এককথায় ভ্রমণ-সাহিত্য গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের অসামান্য দলিল। ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের মন, মানসিকতা, বিশ্বভাবনার পরিচয় ভ্রমণ সাহিত্য গুলিতে পেয়ে থাকি। তাই ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে জানা, বিশ্বভাবনা তাঁর রীতিনীতি, নিয়ে আমার এই গবেষণামূলক কাজ। যে কাজটি সম্পন্ন করতে আমাকে ডায়েরি ও চিঠিপত্র বিশেষভাবে সাহায্য করবে। তাই কবির ভ্রমণ সাহিত্যগুলি নিয়ে কাজ করা আমার আগ্রহ। যার ফলে ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথকে জানা যাবে আর তাঁর রচিত সাহিত্যকে বোঝা আরো সহজ হয়ে উঠবে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জীবনস্মৃতি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, সংস্করণ ১৪২৬, পৃ. ৫২
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, যুরোপ-প্রবাসীর পত্র, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, সংস্করণ কার্তিক ১৪১৭ পৃ. ১৪৩
৩. জীবনস্মৃতি, পৃ. ৫২
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রাশিয়ার চিঠি, বিশ্বভারতী, পুনরমুদ্রণ আষাঢ় ১৪৩১, পৃ. ৩৩
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জাপান যাত্রী, প্রজ্ঞাবিকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ. ৪৩
৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, পথের সঞ্চয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পুনরমুদ্রণ বৈশাখ ১৩৭৬, পৃ. ২৭
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, জাপান যাত্রী, প্রজ্ঞাবিকাশ, তৃতীয় মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৯, পৃ. ৩২
৮. রাশিয়ার চিঠি পৃ. ১৩
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরি, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, পুনরমুদ্রণ ভাদ্র ১৩৯৩, পৃ. ৪৬
১০. রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৪০
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ইউরোপ যাত্রীর ডায়েরি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ প্রকাশ ১৩৯৩, পৃ. ৪৩
১২. জাপান যাত্রী, পৃ. ১৩
১৩. রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৪০
১৪. রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ৪২
১৫. রাশিয়ার চিঠি, পৃ. ১২৩